দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 APR 1987
পৃষ্ঠা 6

শিক্ষা বিস্তারে শের-এ-বাংলার অনবদ্য অবদান

মুন্‌শী আবদুল মান্‌নান

এমন একটা সময় ছিল, যখন এই উপ-মহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের অনুপ্রেরণা, অহংকার ও গর্বের প্রধান উৎসস্থল ছিল তিন জন মহান ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি তিন জন হলেন শের-এ-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন আহমদ। এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বয়সের দিক থেকে শের-এ-বাংলা ছিলেন নজরুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন আহমদের থেকে অনেক বড়। মোহামেডান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাও এর জন্মের অনেক পরে। জ্যেষ্ঠতার সুবাদে তিনি ছিলেন নজরুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন আহমদ ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

শের-এ-বাংলার জন্ম ১৮৭৩ সালে এবং মৃত্যু ১৯৬২ সালে। এই শতাব্দীকালের ইতিহাসের তিনি ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহানায়ক। এই সময় কালের রাজনৈতিক সংগ্রাম সামাজিক সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ পুরুষ। তিনি কেবলমাত্র ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি কেবলমাত্র ইতিহাসের নির্মাতা ছিলেন না, নিজেই ছিলেন এক জীবন্ত ইতিহাস। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেনঃ শের-এ-বাংলাই ছিলেন বাংলাদেশ, বাংলাদেশই ছিল শের-এ-বাংলা। তাঁর সময়কালে এবং এখনও শের-এ-বাংলা বাংলাদেশের পরিচয়ের পতাকা হিসেবেই নন্দিত।

ইতিহাসের এমন এক ক্রান্তিকালে শের-এ-বাংলার জন্ম, যখন তার স্বসমাজ ও স্বধর্মের লোকেরা ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যার পর নেই অবনত, পশ্চাদপদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি এই মৃতপ্রায় সমাজ ও জাতিকে জাগিয়ে তোলার কাজকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন বাংলা কেন, সারা ভারত উপ-মহাদেশ, মুসলমানদের কোনো নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। যখন এই সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো, তখন সমকালীন অন্যান্য মুসলিম নেতার সঙ্গে তিনিও এগিয়ে এলেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো নিখিল ভারত মুসলিম লীগের। এই সংগঠনের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যই ছিলেন না, পরবর্তীকালে তিনি সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে সংগঠনকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন বহুদিন। এই সংগঠনের ফোরাম থেকেই তিনি ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান।

শের-এ-বাংলার সমকালে বাংলাদেশের মুসলমানরা বলতে গেলে ভূমিদাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন, এদেশের মুসলমানরা যেহেতু ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত সুতরাং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে জমিদার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের হাত থেকে ভূমি উদ্ধার করে কৃষকদের হাতে দিয়ে দিতে হবে। তারা যখন প্রকৃত অর্থে ভূমির মালিক হবে তখন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হবে। এবং যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা না হবে ততদিন পর্যন্ত মুলসমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি আসবে না। এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই শেরে-এ-বাংলা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠা করেন কৃষক-প্রজা পার্টি। ইতিহাস সাক্ষী, তাঁরই এই সংগ্রামের ফল হিসেবে জমিদারী প্রথা একদিন এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণযোগ্য যে,শুধু জমিদার নয়, বাংলাদেশের কৃষকদের আর একটি শত্রু ছিল মহাজন শ্রেণী। এদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্যে তারই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় ঋণ-সালিসি বোর্ড। এই বোর্ডের মাধ্যমে কৃষক শ্রেণী মহাজনদের ঋণ ও তস্য ঋণের বোঝা টানা থেকে রেহাই পায়। বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন ও তার সাফল্যের ইতিহাসে এরকম বিশাল ও একক অবদান রাখার কৃতিত্ব শের-এ-বাংলার পরে একমাত্র মাওলানা ভাসানী ছাড়া আর কারো নেই। সমকালে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তার বিচারেও শের-এ-বাংলার সঙ্গে কেবল তুলনা হতে পারে মাওলানারই।

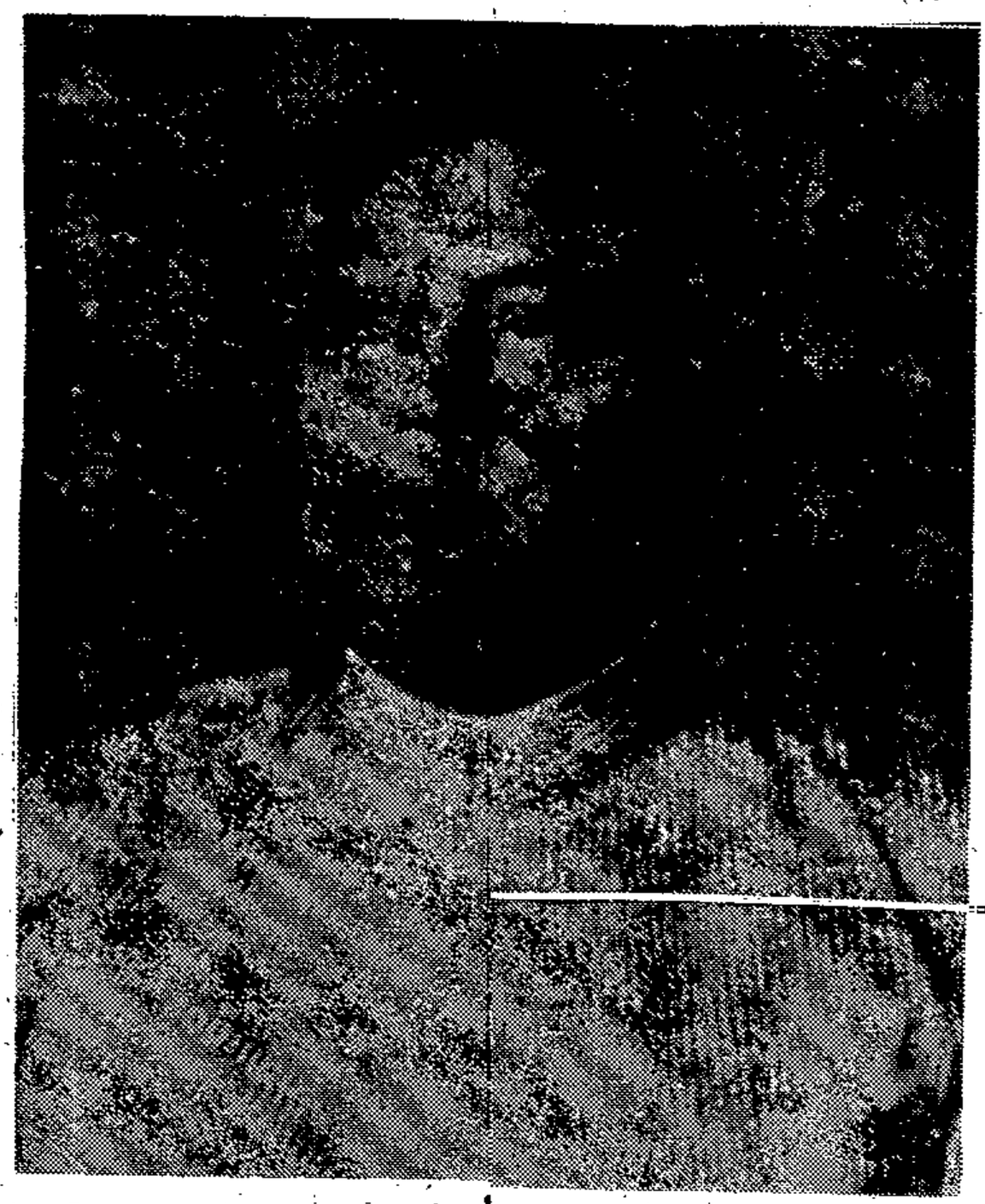

উনিশ শতকের অন্যান্য শীর্ষ মুসলিম নেতার মত শের-এ-বাংলাও বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতাই হোক কিংবা হোক আর্থ-সামাজিক উন্নতি০ এর জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা।

শিক্ষার বিস্তার ছাড়া বাংলার অবনত মুসলমান সমাজের মধ্যে জাগরণ আত্মোপলব্ধি আত্মশ্লাঘাবোধ এবং উন্নয়ন অগ্রগতির প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না। তাই তিনি অন্যান্য সংগ্রামের পাশাপাশি শিক্ষা আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের কাজও আমৃত্যু চালিয়ে যান। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, স্বতন্ত্র জাতি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের পথিকৃৎ, পাকিস্তান প্রস্তাবের জনক কিংবা কৃষকদের মুক্তিদূত শের-এ-বাংলা সম্পর্কে এ যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে, শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষা বিস্তারের নিরলস কর্মী শের-এ-বাংলা সম্পর্কে এত আলোচনা দেখা যায়। সে কালের মাধ্যমিক শিক্ষা আন্দোলনের কথা অনেকেরই জানা। ঐ আন্দোলনে শের-এ-বাংলার ভূমিকা ছিল দ্ব্যর্থহীন। ১৯২৪ সালে যখন তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন তখনই মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বিল তৈরী করেন। কিন্তু সময়াভাবে বিলটি পাস হতে পারেনি। পরবর্তীকালে বিলটি ঐ অবস্থায়ই পড়ে থাকে। পুনরায় ১৯৩৭ সালে যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার তার হাতে আসে তখন সেই বিল পাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এনিয়ে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিচালনাধীন পত্র-পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, শের-এ-বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন বা মধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড বিল পাসের এই প্রয়াসের মূল লক্ষ্য ছিল, শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার তথা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার আলো দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন শের-এ-বাংলা কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। নিজ গ্রাম চাখারে কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এ সত্যই তুলে ধরেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি শহর কেন্দ্রিক হয়ে যায়, তাহলে শিক্ষা বিস্তারে সমতা আসবে না। কাজেই শিক্ষার সুযোগ বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে করে স্বল্প খরচে গ্রামের কৃষক ও দরিদ্র লোকের ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শের-এ-বাংলার ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর ও তাঁর মত আরও কয়েকজন শিক্ষানুরাগী মুসলিম নেতার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রতিষ্ঠালগ্নের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ তখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদর মুসলমানদের যেসব সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং যে অনমনীয় বিরোধিতা অতিক্রম করতে হয়েছিল তা আমার মনে রয়েছে। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে একটি স্মারকলিপিতে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে প্রস্তাব পেশ করলে বড় লাট আশ্বাস দিলেন যে, সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন। ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক সরকারী ইশতেহারে সে প্রতিশ্রুতি সরকারীভাবে সমর্থিত হলো।.....মরহুম স্যার মোহাম্মদ শফি যখন ভারত সরকারের সভ্য ছিলেন, তখন তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁর সাথে একত্রে কাজ করেছি, এবং বাংলার উচ্চতর শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তার সাহায্য ও প্রভাব কামনা করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর বাঙলা সরকারের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইতে হয়। মরহুম স্যার আবদুর রহিমের সাহায্যে আমি সরকারের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার নিয়মিত মঞ্জুরি সংগ্রহ করেছিলাম।

শুধু প্রতিষ্ঠান গড়ে নয়, ব্যক্তিগত সাহায্য সহায়তা দিয়েও তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথ সুগম করেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক আলোচকের একটি উক্তিঃ হক সাহেবের সে যুগের শিক্ষা প্রীতির পরিচয় অনায়াসে মিলতে পারে যদি কলকাতার আদিকালের বইয়ের দোকানীর পুরনো কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা দোকানের পুরানো কাগজপত্র কেউ নাড়াচাড়া করেন। দিনের পর দিন বছরের পর বছর হক সাহেব প্রদত্ত Requisition slip আসত দোকানের মালিকের কাছে, পত্রবাহককে নতুন বই দেবার জন্য।

এই মহাপুরুষ আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর কর্ম ও আদর্শ এখনও অমলিন। যুগ যুগ ধরে তিনি আমাদের চলার পথে অনুপ্রেরণার ও শক্তির অনির্বাণ উৎস হয়ে থাকবেন।